ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭...

প্রসঙ্গ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা তিনটিই বাংলাদেশে উপেক্ষিত

সুদীপ্ত সরকার

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যদশার বীজ বপন করেছিল সেই ইংরেজ শাসকরা যাদের হাতে পত্তন হয়েছিল আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির। লর্ড জন মেকল বলেছিলেন– "We want to create a community of brown english men." বৃটিশদের সেই কেরাণী তৈরির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই স্বাধীনতার দুই যুগ পর আজও ২ শত বছরের দাসত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে চলছে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাকে জীবনমুখী ও সহজলভ্য করার প্রকৃত কার্যকর কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারেনি এদেশের কোন সরকার। যদিও ১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে; কিন্তু মূলত এটি একটি 'আই ওয়াশ' মাত্র। বাজেটের বড় অংশ চলে গেছে আমলা পুষতে, শিক্ষকদের বেতন দিতে আর দালান কোঠা বানানো ও মেরামত করতে। শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন, যেমন– স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার পৌঁছে দেয়া, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাজেটে গুরুত্ব পায়নি।

১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ গত বছরের চেয়ে ২৯৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বেশি। কিন্তু ১৯৯৪–৯৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা বরাদ্দের হার ছিল মোট বরাদ্দের ১৬·৬০ শতাংশ; অথচ এ বছর এই বরাদ্দ ১৬·২০ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও এর শতকরা হার বাড়েনি। এ থেকেই বুঝা যায়, এই বরাদ্দ বৃদ্ধি যতটুকু না আন্তরিকতাপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রদর্শনীমূলক এবং এই শিক্ষাখাতের সঙ্গে এবার জুড়ে দেয়া হয়েছে ধর্মকে। শিক্ষা ও ধর্মকে অভিন্নখাত হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৯৫–৯৬ সালের জাতীয় বাজেটে রাজস্ব বরাদ্দের পরিমাণ ২১৪৮·৪২ কোটি টাকা যার মধ্যে পৃথকভাবে শিক্ষাখাতের রাজস্ব ২১৪৪·৯১ কোটি টাকা। বাজেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রতিরক্ষাখাতে যার পরিমাণ ১৯৩৫ কোটি টাকা। পুলিশ ও বিডিআর আরেকটি পৃথকখাত এবং এতে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৩৭ কোটি টাকা. প্রতিরক্ষা খাত এবং পুলিশ বিডিআরখাতে মোট রাজস্ব বরাদ্দ ২৬৭২ কোটি টাকা যা শিক্ষাখাতে বরাদ্দের চেয়ে ৫২৭·০৯ কোটি টাকা বেশি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, শিক্ষা ও ধর্মকে অভিন্নখাত হিসেবে চিহ্নিত করে প্রতিরক্ষা ও পুলিশ বিডিআরকে দু'টি পৃথকখাত হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা কোথায়।

শিক্ষাখাতে রাজস্ব বরাদ্দের আভ্যন্তরীণ বন্টন থেকে দেখা যায়, বেসরকারি ৫,৫৩৫টি দাখিল বা তদূর্ধ্ব মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে তিন লাখ টাকারও বেশি। পক্ষান্তরে দেশের প্রায় ১২ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের জন্য গড় মাথাপিছু বরাদ্দ প্রায় সোয়া তিন লাখ টাকা। ফলে দেখা যাচ্ছে দেশে স্কুল কলেজের চেয়ে মাদ্রাসাগুলোয় সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ বেশি। মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিগুলো যথাক্রমে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রির সমপর্যায়ের। কিন্তু, পাঠ্যক্রমে কোনরূপ সমতা আনয়ন না করেই এসব ডিগ্রিকে সমান করা হয়েছে, যা দেশে বৈষম্যমূলক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইআরবিডি (ইন-ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট) স্বয়ং মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকার ওপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩শ' বেসরকারি মাদ্রাসার ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে বাস্তবে অনেক মাদ্রাসারই কোন অস্তিত্ব নেই। মাদ্রাসা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যে ছাত্র সংখ্যা প্রণয়ন করে তাও অতিরঞ্জিত বলে জরিপের ফলাফলে জানা গেছে। তবে কি এসব অস্তিত্বহীন ভুয়া মাদ্রাসাও সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ পাচ্ছে?

১৯৯৪ সালের ৫–১৩ই সেপ্টেম্বর কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি কর্মসূচী গৃহীত হয় যে, উন্নয়ন বাজেটের সকল স্তরে কারিগরি শিক্ষা ও চাকরি প্রশিক্ষণের মতো বিনিয়োগের বিষয়টিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে দেশে কোন্ পর্যায়ের কত সংখ্যক জনশক্তির প্রয়োজন হবে তাও নির্ধারণ করবে। অথচ বাংলাদেশে ৯৫–৯৬ অর্থবছরে কারিগরি শিক্ষায় সর্বনিম্ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মোট শিক্ষা বরাদ্দের মাত্র ১·০৯% কারিগরি শিক্ষায় উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য শিক্ষাখাত থেকেই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ২·১৮ ভাগ ও ১·৬১ ভাগ। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি স্থায়ী হাজি ক্যাম্প নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার খরচ শিক্ষাকেই গুণতে হবে। দেশে বিদ্যমান ক্যাডেট কলেজগুলো সামরিক বাহিনীর অধীনে হলেও প্রতিবছর এর বরাদ্দ যাচ্ছে শিক্ষাখাত থেকে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আমাদের দেশে গবেষণা কাজকে বরাবরই নিরুৎসাহিত করেছে। উচ্চ শিক্ষায় পর্যাপ্ত সুযোগ–সুবিধার সীমাবদ্ধতা থাকায় দেশের অনেক মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক বিদেশে গিয়ে গবেষণা করছেন এবং দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করছেন। অথচ তাদের সাফল্য আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কোন সুফল বয়ে আনছে না। সামান্য প্রযুক্তির জন্য আমাদের হাত পাততে হয় সেইসব রাষ্ট্রের কাছে যারা আমাদেরই সমপর্যায়ের ছিল এক সময়। একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে উচ্চ শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, অথচ এ বছর জাতীয় বাজেটে উচ্চ শিক্ষা হয়েছে উপেক্ষিত। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় রাজস্ব বরাদ্দ মোট শিক্ষা বরাদ্দের মাত্র ৭·৬৮%, উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ২·৭১%। বরাদ্দের এত স্বল্পতা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে দেশের উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাইব্রেরিতে বই ও পত্রিকার স্বল্পতা, শ্রেণীকক্ষের অভাব প্রভৃতি সমস্যা বহু বছরের, যার কোন সমাধান হচ্ছে না। আইআরবিডি পরিচালিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০০ গ্র্যাজুয়েটের ওপর এক জরিপের ফলাফলে জানা যায়, পাস করার পর প্রত্যেকে গড়ে আড়াই বছর একেবারে বেকার থাকে। পরবর্তীতে এদের অধিকাংশই এমন সব ক্ষেত্রে চাকরি পায়, যা তাদের লব্ধ উচ্চ শিক্ষায় ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দেশে শিক্ষা ও জনশক্তি দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়। তাই শিক্ষার সাথে সমন্বিত করে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কোন কার্যকর পরিকল্পনা গৃহীত হয় না। এর ফলে প্রতিবছর এমন এক শিক্ষা বাজেট তৈরি হয় যাতে কোন দিক নির্দেশনা থাকে না।

অর্থমন্ত্রীর বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ (মোট শিক্ষা বরাদ্দের ৪৪·৪৫%) দেয়া হলেও এর উপখাত–সমূহের অভ্যন্তরীণ বন্টনে বিপুল অসামঞ্জস্য রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় মোট বরাদ্দের ১ শতাংশেরও কম অর্থ (মাত্র ০·৯৬%) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বন্টন করা হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক ও বেতনভাতা সংক্রান্ত খাতে সিংহভাগ ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হয়েছে. অথচ সারা দেশের মাত্র শতকরা ০·২ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগ্রহশালার অস্তিত্ব রয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে লাইব্রেরি নয়, এর ধারণা মাত্র। গ্রাম ও উপ–শহরগুলোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠ্য বই প্রাপ্তির হার ১৯৮৫ সালে ছিল ৮০% যা ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়ে ১৯৯৪ সালে হয়েছে ৬৬%। এছাড়া, সরকারের বৈষম্যমূলক শিক্ষা–নীতির একটি উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানে একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ৩টি গ্রামের জন্য ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রতিটি গ্রামে গড়ে ২·৩টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে, যার শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষার ১ম –৫ম শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারের বিশাল বরাদ্দের পরিণতি কি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরের বাজেটে মাধ্য–মিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কলেজ ও ডিগ্রি কলেজগুলোর জন্য মোট রাজস্ব বরাদ্দ শিক্ষা বরাদ্দের ৪১·৫১% যা এই তিনটি ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়. দেখা যায়, প্রতিবছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাসামগ্রী ক্রয় ও বিবিধ শিক্ষা খরচের জন্য মোট শিক্ষা বাজেটের ৫% অবশিষ্ট থাকে, যার পরিবর্তন এ বছরও হবে না। দেশের ৪৯% সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং মাত্র ২% বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির অস্তিত্ব রয়েছে যার দরুন দেশে পর্যাপ্ত মেধার সৃষ্টি হচ্ছে না।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। অথচ এ ধরনের একটি ফাঁকা শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন করে তিনি কি ব্যাপক পরিবর্তন আশা করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের অর্থনীতিবিদরা। বিআই–ডিএস–এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ডঃ আতিউর রহমান মন্তব্য করেন, শিক্ষাখাতে দরকার ছিল একটা 'কোয়ান্টাম জাম্প', অর্থাৎ এক লাফে বেশি দূর যাওয়া। তা হলে পরবর্তীকালে এ খাতে বাজেট কমালেও চলত।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের হাত থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। আর এজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেটে তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন। শিক্ষার উপ–খাতগুলোতে অগ্রাধিকারভিত্তিক বন্টন করতে হবে ও বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি পরিহার করতে হবে। শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই উন্নয়ন আসবে না, তা যেন সংশ্লিষ্টরা বিস্মৃত না হন। ভবিষ্যতে লোক দেখানো শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন না করে সরকার অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমাদের শিক্ষার দৈন্য দশা বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণে আন্তরিক হবেন বলে আশা।